Political Science (H), SEM - IV, CC10

জিয়াউদ্দিন বারানী

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

কোরাণ ও হাদিসের সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শন ও খলিফাতন্ত্রের মাধ্যমে তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের যে অভিজ্ঞতা মুসলিম শাসকদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন জিয়াউদ্দিন বারানী (১২৮৫-১৩৫৯)। জিয়াউদ্দিন বারানী মুসলিম শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যে চিন্তা ও তত্ত্ব গঠন করেন তার মূল উদ্দেশ্য ভারতের মাটিতে ইসলামী শাসকের স্থায়িত্ববিধান করা। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি দুই-ই মূলত রাজনৈতিক। স্বাভাবিক কারণেই বারানীকে ইসলামী শাসনের প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মর্যাদা দেওয়া যায়।

সুলতানি যুগের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক হলেন বারানী, তাঁর লিখিত প্রধান পুস্তক 'তারিখ-ই-ফিরোজসাহি', যার পরবর্তী অংশ 'ফতোয়া-ই-জাহানদারি' তাছাড়া তিনি লিখেছিলেন 'হসরৎনামা' ও 'সানা-ই-সোহা'। মধ্যযুগের প্রথম দিকে সমস্ত তুর্কী অভিজাতগোষ্ঠী ভারতে আসেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বারানীর পূর্বপুরুষ।

শাসকের প্রকৃতি ও দায়িত্বসমূহ :

ইসলামের অনুগত অধ্যায়ী হিসাবে জিয়াউদ্দিন বারানী মনে করেন, শাসকের প্রধান কর্তব্য কোরাণের নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করা। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর চিন্তার প্রতিফলন স্পষ্ট। তিনি নিম্নবর্গের মানুষের শিক্ষা ও অগ্রগতির বিরোধী। কারণ এরূপ সুযোগ পেলে তারা শাসনকর্তার একচেটিয়া কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। তাঁর মতে শাসক নিরাপত্তার জন্য সর্বদা প্রহরীবেষ্টিত থাকবেন। তিনি শরিয়েত অনুমোদিত বস্তু ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করবেন না। তিনি তাঁর কর্তৃত্ব যতটা সংযত করতে পারবেন ততই তিনি আশীর্বাদপূত হবেন। বারানী শাসকের কর্তব্য নির্দেশ করে আরো বলেন—

১. শাসক তাঁর পরামর্শদাতা পরিষদের সঙ্গে রাজ্যশাসন বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। পরিষদবর্গ এমনভাবে পরামর্শ দেবেন যাতে শাসকের মঙ্গল হওয়া ছাড়াও বিষয়টির সকল দিকে ভালোভাবে বিবেচিত হয়।

২. রাজকার্য পরিচালনায় শাসক সর্বদা ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। কারণ ন্যায় বিচারই অত্যাচার নিবারণ করে ও ধর্মীয়

নির্দেশগুলিকে শক্তিশালী করে।

৩. ন্যায়সঙ্গত শাসনের সুষ্ঠু প্রবর্তনের জন্য শাসককে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় গুপ্তচর নিয়োগ করতে হবে।

৪. ঈশ্বরের কাছে শাসক সর্বদা প্রণত থাকবেন। মিথ্যাচার শাসকের দুর্বলতা ও ধর্মদ্রোহিতার সহায়ক। সুতরাং জনস্বার্থে শাসককে সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৫. পরকালের সুখ-সম্মান অন্তরের সৌন্দর্যের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে শরীরের সমৃদ্ধির পরিবর্তে অন্তরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে সুলতান রাজকার্য সম্পাদন করবেন।

৬. বারানীর অভিমত অনুযায়ী সাফল্যের সঙ্গে রাজকার্য সম্পাদনের জন্য সুলতানের বাদশাহী দাপট থাকা দরকার। শাসকের রাজকীয় মর্যাদা ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রা; রাজদরবারের প্রতি প্রজাদের ভয়ভীতি প্রভৃতি যুক্ত থাকা দরকার।

৭. রাজার হৃদয় হবে প্রজামঙ্গল। প্রজাসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য সাধনে এবং প্রজার সেবায় সম্রাট হবে উৎসর্গীকৃত।

৮. ''প্রজাবর্গ সুখে নিদ্রা যায়, কিন্তু সার্বভৌম সদা সজাগ থাকেন''— এই আপ্তবাক্যকে সম্রাটের মর্যাদা দিতে হয়।

৯. আইন, শাসন ও বিচার, সরকারের তিনটি বিভাগের সাফল্য-অসাফল্য রাজার ভূমিকার উপর নির্ভরশীল।

১০. রাজা সত্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি আত্মসমীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১১. যথার্থ মানসিকতা ও নৈতিকতার অধিকারী হওয়ার জন্য রাজা সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট থাকবেন।

১২. পিতৃসুলভ সন্তান স্নেহে রাজা প্রজাপালন করবেন। তিনি রাজ্যের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণে যত্নবান হবেন।

১৩. শাসককে সর্বদাই মনে রাখতে হবে তিনি ঈশ্বরের অনুমোদন পেয়েছেন। সুতরাং রাজকার্যে শাসক পাঁচটি বিষয় পরিহার করে চলবেন; যথা—

ক) মিথ্যাচার,

খ) পরিবর্তনশীলতা,

গ) প্রতারণা,

ঘ) আক্রোশ পরায়ণতা,

ঙ) অন্যায়ের প্রশ্রয় ও পরিবৃদ্ধি।

সর্বপরি বলা যায় যে, মুসলিম শাসক হবেন ধর্মমত নির্বিশেষে সাম্রাজ্যের প্রত্যেকের, এমনকি সমগ্র মানব জাতির রক্ষক।

সমালোচনা :

শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বারানীর চিন্তাভাবনা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। যেমন—

১. ইতিহাসবিদ হেনরী ইলিয়টও বারানীর সমালোচনা করেছেন এবং বারানীকে 'পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিক' হিসাবে অভিযুক্ত করেছেন। বারানী সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুলতানদের কাজকর্ম বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

২. বারানী ধর্মের দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন। তিনি রাজনীতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে সমর্থন করেন নি।

৩. অনেকের অভিযোগ অনুসারে বারানী ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইলসামীকরণের ব্যাপারে অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়েছিলেন।

৪. বারানীর ইসলামীয় ভাবধারায় অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতার অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই কারণে অভিযোগ করা হয় যে, বারানীর ইসলাম সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট।

৫. বারানী ইসলামীয় মতাদর্শের মাপকাঠিতে যাচাই করে রাজনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে অভিযোগ করা হয় যে, বারানীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক।

পরিশেষে বলা যায় মধ্যযুগের সমকালীন রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-বিবাদ ও অস্থিরতা ছিল। বারানী সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির এক অস্থির পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্রকে বৈধতা প্রদানের ব্যাপারে যত্নবান হয়েছেন।

Political Science (H), SEM - IV, CC10

আবুল ফজল

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

মধ্যযুগের প্রতিভাধর ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রদার্শনিক আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০৩) ধর্মীয় উদারতা, সহনশীলতা ও সুদক্ষ প্রশাসনের তত্ত্বকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সময়ে মোঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভারতে স্থিতি লাভ করেছে। সম্রাট আকবরের জীবনী ও চরিত্র চিত্রন করার গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তাধারা বহন করার সূত্রে আবুল ফজল আকবর প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে নথিভূক্ত করেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত করেন নিজের সহিষ্ণু, যুক্তিবাদী ও মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গী যা তাঁকে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববাদের আসনে উত্তীর্ণ করে। তাঁর রচিত মূল পুস্তক 'আকবরনামা'র একটি অংশ 'আইন-ই-আকবরী' নামে খ্যাত। সম্রাট আকবরের উদার ও সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রেরণাদাতা হিসাবে আবুল ফজলের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অনুমান করা যায়। মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ভাবনার বিকাশে আবুল ফজলের অবদানগুলি হল—

১) রাজপদ সম্পর্কিত অবদান :

আবুল ফজল রাজার ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, রাজার অধিকার সূর্য থেকে উৎসাহিত। সুতরাং তিনি ঐশ্বরিক ইচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়েই ক্ষমতা দখল ও প্রয়োগ করেন। তাঁর কর্তৃত্ব ঈশ্বরপ্রদত্ত তবে ঈশ্বরের ছায়া ও রাজার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ শর্তহীন নয়। ফজল মনে করেন যে, রাজতন্ত্র হল ঐশ্বরিক উপহার। কিন্তু যতক্ষণ একজন ব্যক্তির মধ্যে বহু সহস্র শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর একত্র সম্মিলন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই ঐশ্বরিক উপহার লাভ করা যায় না। জাতি বা কুল, ধন-সম্পদ, নেতৃত্বদান কোনো কিছুই এই পদ লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং যে সকল পবিত্রগুণ থাকলে রাজপদ লাভ করা সম্ভব তাদের কয়েকটি হল— মহানুভবতা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, বিস্তৃত কর্মব্রহ্ম উন্নত বোধ শক্তি, আন্তরিক ক্ষমাশীলতা, সাহস, শৌর্য-বীর্য ও ধৈর্য প্রভৃতি। শাসকের এই সকল গুণাবলী তাঁকে এমনভাবে প্রজামণ্ডিত করে তোলে যার ফলে অন্যায় প্রকৃতি ও অশোভন ক্রোধ সংযত হয় এবং তিনি এই উচ্চাসনের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন।

২. শাসকের গুণাবলী সম্পর্কিত অবদান :

আবুল ফজল সার্বভৌম শাসককে সকল শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আধার হিসাবে দেখেন। তিনি আরো মনে করেন, শাসক হবেন উদার দৃষ্টিসম্পন্ন, উৎসর্গীকৃত, ঐশ্বরিক দয়ার প্রতি বিশ্বস্ত ও প্রার্থনায় আগ্রহী, সদা সক্রিয় এবং ধর্মীয় বিভিন্নতার উর্ধ্বে। শাসক হলেন 'ঈশ্বরের ছায়া'। আসলে ঈশ্বরই সবকিছু করেন আর শাসক ঈশ্বরের সেই সর্বব্যাপী কর্মের মাধ্যম মাত্র। শাসকপদ আসলে ঐশ্বরিক আলো। শাসক সেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন ঈশ্বরের দয়ায়।

৩. প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অবদান :

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও আবুল ফজল সম্রাটের একক প্রাধান্যে আস্থাশীল। সম্রাট যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই পদ পেয়েছেন সেহেতু তিনি প্রশাসনের কেন্দ্রে স্থিত থাকবেন। মন্ত্রি পরিষদ বা প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে তিনি মুক্ত থাকবেন। সম্রাট মনে রাখবেন তাঁর কর্তব্য কঠিন এবং কোনোভাবেই এই পবিত্র কর্তব্যে অবহেলা করা চলে না। তিনি তার প্রতিটি কাজের সম্ভাব্য ফলাফল বিষয়ে সতর্ক থাকবেন; অন্যথায় তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ ঘটতে পারে।

৪. বিচার সংক্রান্ত অবদান :

আবুল ফজল ন্যায় সংগত বিচারের প্রবল সমর্থক। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'হাকিম-ই-আদিল' এর ধারণা প্রচার করে বলেছেন, রাজতন্ত্রের মৌলিক উপাদান হিসাবেই ন্যায়-বিচারকে তুলে ধরতে হবে এবং এই নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া ঠিক নয়। ফজল আরোও বলেছেন, সার্বভৌম শাসক নিজেই ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত আলো। যে কোনো বিচারের ক্ষেত্রেই তাঁর সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য।

৫. শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত অবদান :

শাসককে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, তিনি ঈশ্বরের অনুমোদন পেয়েছেন। ফজলের মতে, রাজকাজে শাসক পাঁচটি বিষয় সর্বদা পরিহার করে চলবেন; যথা— ক) মিথ্যাচার, খ) পরিবর্তনশীলতা, গ) প্রতারণা, ঘ) আক্রোশ পরায়ণতা, ঙ) অন্যায়ের প্রশ্রয় ও পরিবৃদ্ধি।

এছাড়াও মধ্যযুগে আবুল ফজল তার আলোচনায় শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যে বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন; সেগুলি হল— ক) আইন, শাসন ও বিচার সরকারের তিনটি বিভাগের সাফল্য-অসাফল্য রাজার ভূমিকা উপর নির্ভরশীল; খ) 'প্রজাবর্গ সুখে নিদ্রা যায়, কিন্তু সার্বভৌম সদা সজাগ থাকেন' এই আপ্তবাক্যকে

সম্রাটের মর্যাদা দিতে হবে; গ) রাজা সত্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি আত্ম সমীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন; ঘ) যথার্থ মানসিকতা ও নৈতিকতার অধিকারী হওয়ার জন্য রাজা সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট থাকবেন। ঙ) পিতৃসুলভ সন্তান স্নেহে রাজা প্রজাপালন করবেন। তিনি রাজ্যের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণে যত্নবান হবেন, ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় মধ্যযুগের রাষ্ট্র ভাবনা বিকাশে আবুল ফজল একই সঙ্গে ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্রচিন্তাবিদ রূপে পরিচিত। 'আকবরনামা'য় তিনি সমকালীন যুগের যথাসম্ভব নির্ভুল চিত্রায়ন করেছেন। তৎকালীন পরিস্থিতি লক্ষ করলে দেখা যায় ইসলামী শাসনের তীব্র ধর্মকেন্দ্রিকতা ও ধর্মের দ্বারা রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। বিশাল ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় তখন ইসলাম আর নবাগত নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার দিকে ক্রম অগ্রসরমান। আবুল ফজল মূলত সেই ধারাকেই তাঁর চিন্তা-চেতনায় প্রতিবিম্বিত করেন। আবুল ফজলের এই অবদান স্বরূপ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যভাবনা আজ পর্যন্ত শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সাধারণ ভারতীয় জনজীবনের সংস্কৃতিতে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে।

Political Science (H), SEM - IV, CC10

ভক্তিবাদ

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে ভক্তিবাদ এক প্রাচীন তত্ত্ব। বৈদিক সাহিত্যে, মহাযানী সাধনতত্বে, রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থাদিতে ভক্তিবাদের আদর্শ বিধৃত রয়েছে। খ্রিস্ট্রিয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে দশম-একাদশ শতকের পর্বে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব আলোয়ারগণ ও শৈব নয়নাগণ ভক্তি সাধন ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রায় একই সময়ে উত্তর ভারতে ভক্তি ধারার প্রবাহ শুরু হয়। দ্বাদশ শতক হতে ইসলামের আগ্রাসনের কারণে হিন্দু ধর্মাদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এসময় বৈষম্য বিজড়িত হিন্দু সমাজের অনুন্নতদের টেনে তোলার প্রচেষ্টাও শুরু হয়। এই সূত্রে ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসেবে ভক্তি আন্দোলনের প্রকাশ ও প্রসার ঘটে।

উদ্ভব (Origin) :

ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব সংক্রান্ত দুই প্রধান অভিমত হল— (১) ভক্তি আন্দোলন ইসলামের আগ্রাসন ও অভিলাষের এক প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া, (২) ভক্তিতত্ত্ব এক প্রাচীন তত্ত্ব। সুপ্রাচীন কাল হতে ভারতে এই তত্ত্বের ধারা প্রবাহমান ছিল। মধ্যযুগের ভারতে হিন্দুধর্মের সংস্কারের প্রয়োজনে ভক্তিতত্ত্বের জোরদার রূপায়ন শুরু হয়।

K. M. Panikkar, Tarachand, Ahamad Nizami এবং Qureshi প্রমুখ ঐতিহাসিকদের প্রাসঙ্গিক মুল বক্তব্য হল—

মুসলমান অভিযান ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দু ভারতের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি সবিশেষ আলোড়িত হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রের হতাশা সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রগুলিতে চেপে বসে। এ সময় ভেদাভেদ বিড়ম্বিত ও আস্পৃশ্যতা পীড়িত হিন্দু সমাজ এবং আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম সাম্যবাদী ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ধর্মাদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বৈষম্য এবং নিম্নবর্গের মানুষজনের প্রতি উচ্চবর্গের মানুষজনের মানবতা বিরোধী সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার ও লাঞ্ছনার কারণে হিন্দু সমাজের একাংশ বৈষম্যহীন মুসলমান সমাজও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সুফী সন্তদের সহজ সরল ধর্মাদর্শ হিন্দু ধর্মাদর্শের ত্রুটি গুলি তুলে ধরে। এ কারণে

অন্ত্যজ হিন্দুরা ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠে। এছাড়া এ সময় হাজী কাজী ও মওলানারা প্রচার করতে থাকেন— ইসলামের সহজ ধর্মাচার অনুশীলন সূত্রে বেহেশ্‌ত তথা স্বর্গের দ্বার সকলের কাছে অনায়াসে মুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সামাজিক ন্যায় ও অনায়াস লভ্য মুক্তির আশা অন্ত্যজ হিন্দুদের একটি বড়ো অংশ ইসলামে অন্তরিত হওয়ার বিষয়ে উৎসাহী হয়। এবং ক্রমে ক্রমে দলে দলে অন্তরিত হতে থাকে। এছাড়া শাসকবর্গ তাদের জেহাদী ধর্মাদর্শ অনুসারে কাফেরদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে উদ্যোগী হন। এমতাবস্থায় অন্ত্যজ হিন্দুদের ধর্মান্তর রোধের বিষয়টি হিন্দু সমাজে গুরুত্ব পায়। সে কারণে সমাজ সংস্কার ও সেই সঙ্গে ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভূত হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে রামানন্দ, নামদেব, কবীর, নানক ও চৈতন্য প্রমুখ সাধকগণ হিন্দু সমাজকে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের কলঙ্ক মুক্ত করা জন্য এবং হিন্দু ধর্ম চর্চাকে সহজ সরল ও বৈষম্যহীন করে তোলার জন্য সহজ পন্থা গ্রহণে প্রবৃত্ত হন। তাঁরা অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বৈষম্যগুলির নিন্দা করেন। তাঁরা প্রচার করেন— সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। সেহেতু মানুষে মানুষে ভেদ নেই। এভাবে তারা ভক্তি ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় সাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ব্রতী হন।

উপরিলিখিত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হল— ''The Bhakti Movement was largely an out come of the muslim impact on the Indian Society.'' (Tarachand)

Jadunath Sarkar এবং A. C. Benerjee প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ভক্তি আন্দোলনকে ইসলামীয় প্রভাবে ফলশ্রুতি বলে স্বীকার করেন নি। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য হল— বহু প্রাচীন কাল হতে ভারতে একেশ্বরবাদী ভক্তি সাধনা প্রচলিত ছিল। বৈদিক সাহিত্য, মহাযানী সাধনতত্ত্বে, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা ও পুরাণ গ্রন্থাদি এর অকাট্য প্রমাণ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক থেকে শৈব নয়নার ও বৈষ্ণব আলোয়ারগণ দক্ষিণ ভারতে ভক্তি সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন। এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন থেকে তারা সহজ সামাজিক জীবন যাপন ও ধর্মাচরণের শিক্ষা প্রচার করতেন। এই যুক্তির ভিত্তিতে Sarkar এবং Benerjee-র সিদ্ধান্ত হল— মধ্যযুগের ভারতের ভক্তি আন্দোলন কোন এক নতুন ধর্ম আন্দোলন নয়। হিন্দু ধর্মের গ্লানি অপনোদনের জন্য ভক্তি সাধনার বীজমন্ত্রকে মুখ্য অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে এই সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তবে এই প্রসঙ্গে তারা একথাও বলেছেন যে— ত্রয়োদশ শতক থেকে ভক্তি আন্দোলনের বেগবান প্রবাহের পেছনে ইসলামী শাসন, ইসলামী একেশ্বরবাদী ধর্ম দর্শন ও ইসলামী সামাজিক সমতাবাদের প্রভাবও বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল।

বৈশিষ্ট্য (Feature) :

ভক্তিতত্ত্ব এক বিশেষ ধরনের মুক্তি তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল কথা হল ভাবচক্র বন্ধন হলে মুক্তির সাধনাই হল ভক্তি সাধনা। ভক্তি সাধনা সূত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটে এবং এই সূত্রে জীবের মুক্তি হয়।

ভক্তিবাদ অনুসারে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সকল ধর্মের মূল। এই প্রসঙ্গে কবীর বলেন— হিন্দু ও মুসলমানের দেবতা আলি আর রামের মধ্যে ভেদ নেই। এ শুধু নামের ভেদ।

ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বত্র তার অধিষ্ঠান। তিনি মন্দিরে নেই, মসজিদেও নেই। তিনি কাবাতেও নেই, কৈলাসেও নেই। সকল হৃদয়ে তার অবস্থান। এই প্রসঙ্গে কবীরের প্রশ্ন হল— বিশ্বকর্মা যদি কেবল মন্দিরে কিংবা মসজিদে থাকেন তবে বিশ্বসংস্কার কার নিকেতন?

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ সূত্রে ঈশ্বর লাভ তথা মুক্তি হয় না। কেননা, ঈশ্বর আচারেও নেই। আবার অনুষ্ঠানেও নেই। তিনি যোগেও নেই, বিয়োগেও নেই। কবীরের কথায় ঈশ্বর যেহেতু মানুষের মনেই রয়েছেন, সেহেতু অন্তর মন্দিরে পরম ব্রহ্মেরে সন্ধান করতে হবে। মন না রাঙায়ে বসন রাঙিয়ে যোগী হলে যোগের ফল শুন্য হবে।

কবীর ও নানক মুর্তি পূজার বিরোধী। কেননা, পাথরের মুর্তিপূজা করে ঈশ্বর লাভ সম্ভব হলে সকলেই পাহাড় পর্বতের আরাধনায় ব্যাপৃত হয়। কবীর ও নানকের মতে মুর্তি পূজা অজ্ঞতার নামান্তর। তবে রামানন্দ ও চৈতন্যদেব মূর্তির মধ্যে পরম প্রেমময় ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন।

ভক্তিসাধকদের মতে অন্তর শুচিতাই মুক্তির সোপান। বিশুদ্ধ ভক্তিই জীবকে মুক্তির সোপান ধরে চলতে সাহায্য করে এবং পরিনামে তার ভবচক্র বন্ধনের মুক্তি ঘটায়। অতএব তীর্থভ্রমণ ও গঙ্গাস্নান এবং নমাজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মুক্তি আসে না।

ভক্তিতত্ত্ব অনুসারে সব মানুষই পরম প্রেমময় ঈশ্বরের সন্তান। পরম পিতার কাছে উচ্চ-নীচ, ধনী-নিধন, জাত-বেজাত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বাছ বিচার নেই। রামানন্দ বলেন— রামের সন্তানদের মধ্যে ভেদ থাকতেই পারে না। এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি মুচি রবিদাস (রুইদাস), জোলা তাঁতী কবীর, নাপিত সাইদাস, কসাই সাধন প্রমুখ তথাকথিত নীচু জাতের মানুষদের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন।

চৈতন্যদেবের মতে প্রাণী মাত্রই কৃষ্ণের জীব। তাদের মধ্যে ভেদ থাকতে পারে না। হরিভক্তি পরায়ন চণ্ডালও ভক্তি গুনে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হতে পারে। সেহেতু চৈতন্য

পন্থীদের সর্বস্ব হল রামানুজ ভক্তি।

ভক্তিবাদ অনুসারে ধর্মের ভেদ ও জাতের ভেদ অজ্ঞতা প্রমুখ ভেদ। শাস্ত্রকার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মত্তলানারা ভুলে যান যে, সব মৃৎপাত্রের উপাদান মাটি এব সব মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি।

কৃচ্ছসাধন ও বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি নেই। তা শুধু নুপংস তৈরি করে। এই প্রসঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের নির্দেশ হল— অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও মহানন্দময় মুক্তির আস্বাদন সম্ভব। সেহেতু ব্যক্তির স্বাভাবিক গার্হস্থ্য ধর্ম মুক্তি সাধনের অন্তরায় নয়।

ভক্তিসাধকগণ ভক্তিসাধনার জন্য সদ্ গুরুর প্রয়োজনের কথা বলেছেন। সদ্গুরু সৎ-অসৎ এবং শুভ-অশুভের ভেদ নিরসন করেছেন এবং ভক্তিমার্গীয় সাধন যাত্রা সহজ করেছেন।

ভক্তি সাধনার উপরোক্ত সহজ সরল মানবিক নীতিগুলি হিন্দু-সমাজের জাত-বেজাত ও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বৈষম্য নিরসনের ক্ষেত্রে এক হৃদয়স্পর্শ আবেগের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ইসলামী আগ্রাসন রোধের বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। এই সূত্রে দ্বাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের ভারতে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠে।

সমাজ ও রাজনীতিতে প্রভাব (Impact on Religion and Society) :

ভক্তিবাদ এক ধর্মীয় আন্দোলন। তবে সুলতানী পর্বের ভারতে তা এক সামাজিক আন্দোলনের চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে উঠে। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে তা আঞ্চলিক ও স্থানিক রাজনীতির উপরও প্রভাব ফেলে।

নবম-দশম শতক থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারতীয় সমাজ বিবিধ বিষম অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাদির বিধিবিধানের কঠোরতা ঐ অস্থিরতায় নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে। উল্লেখ্য, সাধারণ ধর্মাচারও ঐ অস্থিরতার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। ফলে হিন্দু ধর্মে গ্লানি জমতে শুরু করে। ধর্মের গ্লানি সামাজিক ভেদাভেদ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলে। এ কারণে ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে ইসলামের আগ্রাসন ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটে। বিজয়ী বিধর্মী শাসকের জেহাদী আগ্রাসন ও ইসলাম ধর্মের সমতাবাদী ও সামাজিক ন্যায়বাদী অভিঘাতের কারণে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুসমাজ পতিরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। তারা লক্ষ করেন— জাত-পাত ও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচার অপাংক্তেয় হয়ে থাকা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মে অন্তরিত হচ্ছে। মনুবাদী হিন্দু সমাজ শিরোমণিরা হিন্দু ধর্মকে সংকটমুক্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে সমাজকে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের লক্ষণরেখা দিয়ে ঘিরে রাখার বিষয়ে প্রয়াসী হন। ফলে প্রায় গতিহীন হয়ে

থাকা হিন্দু সমাজ এক অচলায়তনে পরিণত হয়। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের এই সংকটকালে রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক ও চৈতন্য প্রমুখ ভক্তি সাধকগণ ধর্ম সংস্কারের ভূমিকায় হাজির হন।

জীবের মুক্তি সাধনের সহজ সরল ভক্তিতত্ত্ব মখ্যতঃ হিন্দুধর্মকে তার শাস্ত্র আশ্রয়ী কঠোরতা এবং তৎপ্রস্তুত বিবিধ কলুষতা ও গ্লানি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। ভক্তিসাধকগণ ইসলামের প্রবল সাম্যবাদী আহ্বানের অভিঘাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষার বিষয়ে ব্রতী হয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাদের সামাজিক ক্ষমতার তত্ত্বটিকে তুলে ধরে অছ্যুত, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ মানুষের কাছে সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জোগান। মানুষে মানুষে ভেদ নেই। সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। সেহেতু সমাজে জাত-বেজাত এবং স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বাছ-বিচার থাকতেই পারে না। তাদের কথায় সামাজিক ভেদাভেদ কৃত্রিম, তা মনুবাদী সমাজের সৃষ্টি সেহেতু তা ঈশ্বরীয় ভেদ নেয়। রামের সন্তানদের জাত-বেজাতের প্রশ্নই উঠে না— এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রামানন্দ মুচি রবিদাস, জোলার তাঁতী কবীর, নাপিত সাঁইদাস এবং কসাই সাধন প্রমুখ নিম্নবর্গীয়দের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় যবন হরিদাস ও বৈষ্ণ্যদেবের শিষ্যত্ব পেয়ে যান। এই সূত্রে স্পষ্ট হয় ভক্তি আন্দোলন মধ্যযুগের হিন্দু সমাজে এক বিশেষ ধরনের গতিশীলতা (Social Mobelity) সঞ্চার করে। ফলে অন্ত্যজ হিন্দুদের ইসলামে অন্তরিত হওয়া রুদ্ধ হয়।

ভক্তি আন্দোলনের সাংস্কৃতিক মুল্যও অপরিসীম। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন— চৈতন্যের দিব্য প্রেরণা গুণে বাঙালির প্রতিভা ধর্ম, দর্শন চিন্তা, সাহিত্য ও সংগীত কলায় বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পায়। ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— চৈতন্য প্রণোদিত বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন ভারতীয় ভাব ভাবনা, মনন চিন্তন ও নৈতিকতায় এক সুমহান মহত্বের প্রভাব ফেলে। ভক্তি আন্দোলন পর্বে ভারতীয় শাস্ত্রাদি ও তাদের টীকা টিপ্পনী সংস্কৃতের খোলস মুক্ত হয়ে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ পায়। এই সূত্রে হিন্দী, বাংলা, মারাঠা, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতি সম্পন্ন নতুন নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। ভজন গান ও কীর্তনাদি সঙ্গীত রাজ্যে মান্য জ্ঞানের অধিকারী হয়। এভাবে ভক্তি আন্দোলন সংস্কৃতি কুসুমের বিকাশ ঘটায়।

ভক্তি আন্দোলনে হিন্দু মনে এক ধরনের সংহতি বোধ জাগরিত করে। হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়— কাজী নবদ্বীপে কীর্তন নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলে চৈতন্য বলে ওঠেন—

ভাঙিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে
কীর্তন করিব দেখি কোন কর্ম করে।

উল্লেখ্য, জাগ্রত হিন্দু জনতার কাছে কাজী নতি স্বীকার করেন। নবদ্বীপে কীর্তন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

উপরোক্ত আলোচনা সূত্রে স্পষ্ট হয়— ভক্তি আন্দোলন সুখ্যাত ধর্মীয় আন্দোলন হলেও তা যথার্থই এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন এবং তা হিন্দু ধর্মীয় সংহতির নির্দেশক আন্দোলনের যথাযোগ্য মর্যাদার অধিকারী। তবে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না।

কবীর (Kabir)

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সর্বাপ্রেক্ষা উদারপন্থী সংস্কারক ছিলেন কবীর। তাঁর জন্ম, মৃত্যু, প্রাক-সাধন জীবন সবই রহস্যবৃত। তবে তিনি ছিলেন রামানন্দের খ্যাতনামা শিষ্য। কিংবদন্তী, তিনি ছিলেন এক হিন্দু বিধবার সন্তান। শৈশবে মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তিনি এক মুসলমান তাঁতির গৃহে লালিত পালিত হন এবং পালক পিতার পেশা গ্রহণ করেন। কিন্তু কাশীতে বসবাসের সময় তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের সাধুসন্তদের সংস্পর্শে আসেন।

এইসব সাধুসন্তগণ ভারতবর্ষের উর্বর ভূমিতে সমন্বয়ের বীজ বপন করেন। উত্তর ভারতে রাজপুতদের পরাজয় ও দিল্লীতে তুর্কী সুলতানদের রাজত্ব স্থাপনের পর ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ও ক্ষমতা লোপ পায়। এর ফলে নাথপন্থী প্রমুখ কয়েকটি আন্দোলন বর্ণব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সঙ্গে সুফী সন্তরা ইসলাম ধর্মের সাম্য ও ভাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করেন। ফলে দেশবাসীরা আর পুরাতন ধর্মে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না, তারা এমন এক ধর্মের জন্য উৎসুক হলেন যার মধ্যে থাকবে আবেগ ও যুক্তির সংমিশ্রণ। এইসব কারণেই খ্রিস্ট্রিয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে উত্তর ভারতে ভক্তিবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটল।

ধর্মের দিক থেকে কবীর ছিলেন রহস্যবাদী। ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ দুইই তার কাছে সমাদৃত ছিল। পার্থিব দেহধারী বা অবতাররূপী ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করতেন না। একমাত্র পরমেশ্বরে আস্থা তিনি লাভ করেছিলেন যোগ পন্থার প্রবর্তক গোরক্ষনাথ প্রদর্শিত নাথপন্থী ঐতিহ্য থেকে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মকে কবীর প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতেন। এই ক্ষেত্রে কবীর ভক্তিধর্ম ও সুফী মতবাদ এই দুইয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন (Kabir was influence by two strains of religious perception the Indian Bhakti or faith and the Sufi 'Ishq or Love')।

কবীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ দূর করে শান্তি ও শুভেচ্ছা এবং

পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভাব বিনিময়ের পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কবীর ছিলেন একেশ্বরবাদ। তিনি বলতেন ঈশ্বর এক, কেবল নামে ভিন্ন। তিনি ঈশ্বরকে রাম, হরি, গোবিন্দ, আল্লাহ, সাই, সাহিব প্রভৃতি নামে ডাকতেন। তিনি মূর্তি পূজা, তীর্থ যাত্রা, স্নান যাত্রা, কঠোর তপস্যা, বাহ্যিক আচার-আচরণ যেমন শাস্ত্র পাঠ, নমাজ পাঠ সমর্থন করতেন না। সাধু জীবনযাপনের জন্য গৃহত্যাগ করার পক্ষপাতীও তিনি ছিলেন না। যোগ সাধনায় পরিচিত হলেও প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর তপস্যা ও গ্রন্থচর্চা অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি মিনে করতেন না। আধুনিক ঐতিহাসিক তারাচাঁদ বলেন— সর্ব-ধর্ম-বর্ণ-সমন্বয়ী প্রেমের ধর্ম প্রচার করাই ছিল কবীরের লক্ষ্য। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের সেই সব আচার-আচরণ যা সমন্বয় বিরোধী এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন করে না কবীর সেই সব বর্জন করলেন।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার অনুগামীদের বলা হয় 'কবীরপন্থী'। জনসাধারণের বোধগম্য হিন্দী ভাষায় তিনি সুন্দর সুন্দর দোঁহা রচনা করেন। কবীরের দোঁহাগুলি একদিকে আধ্যাত্মিক সম্পদ, অন্যদিকে হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

পরিশেষে বলা যায় ভক্তিবাদী সাধকগণ বিশেষত কবীর জীবনাদর্শের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যা পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রায় অম্লান ছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে পরবর্তীকালে আকবরের ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও নীতিতে তার প্রতিফিলন দেখা যায়। ভারতে মুসলমানদের আগমণের পর নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে হিন্দু ধর্মের পুনঃসংস্কার হলো এবং এই প্রাচীন ধর্ম রক্ষার জন্য গোঁড়া রক্ষণশীলরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এইভাবে খ্রিস্টিয় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত চিন্তা ও ধর্মের ক্ষেত্রে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলে ছিল দুটি চিন্তাধারার মধ্যে সংগ্রাম— একদিকে উদার ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা, অপরদিকে গোঁড়া ও ঐতিহ্যবাদী চিন্তাধারা। এই সংগ্রামে কবীর, নানক ও অন্যান্য সমচিন্তাশীল ব্যক্তিদের ধ্যানধারণার প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :—

১. Mediaval India : Form Sultanat to the Mughals - Satish Chandra.

২. ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা— সত্যব্রত চক্রবর্তী।

৩. ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন ও জাতীয় আন্দোলন— সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য।

৪. আদি ও মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাস— তেসলিম চৌধুরী।

৫. ভারতের ইতিহাস তুর্ক-আফগান যুগ— ড. গৌরীশংকর দে।